১৪০০ সাহিত্য

১৭ বর্ষ ১ম সংখ্যা
৭ই পৌষ ১৪১৬

১০০০ সাহিত্য

১ম সংখ্যা ১৭ বর্ষ

৭ই পৌষ, ১৪১৬

সম্পাদক

প্রদীপ ভট্টাচার্য্য

প্রকাশক ঃ অরবিন্দ নন্দী

বোলপুর (শান্তিনিকেতন)

বীরভূম

যাঁরা লিখেছেন

হৃদ্ মাঝারে রাখব ...	প্রদীপ ভট্টাচার্য্য
শ্রদ্ধায় স্মরণে ক্ষমা ঘোষ	অরবিন্দ নন্দী
রবীন্দ্রনাথের সুবল-সখা ক্ষিতিমোহন সেন	অমিতা সেন
‘আনন্দ সর্বকাজে’ কিভাবে ফিরে আসবে আবার?	শ্যামলী খাস্তগীর
একগুচ্ছ সনেট	কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়
মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	মনোজ চক্রবর্তী
রবীন্দ্রনাথের গান	পুলক দত্ত
নিখিলেশ রায়ের দুটি কবিতা	*দিনকাল শেষ বাঁশী*
শেষ বিকেলের আলো	সুমিতেশ সরকার
প্রবীর দাসের চারটি কবিতা	
অতীত বিনুরিয়ার কিছু কথা	শুভব্রত সেন
বীরভূমের লোকসংস্কৃতির তথ্যানুসন্ধান	কামদেব গোস্বামী
দুটি কবিতা	অপরাজিতা বর্ধন
দুটি কবিতা	মলয় মুখোপাধ্যায়
দুটি কবিতা	*তপন দাস*
বরেন বসু ঃ *নিষিদ্ধ কমিউনিষ্ট এবং বজ্র-বিদ্রুপ*	জ্যোতিপ্রসাদ রায়
কবিতার জন্মবিজ্ঞান, একটি কবিতার অনুষঙ্গ (লালপাহাড়ির দেশে যা)	অরুণকুমার চক্রবর্তী
৪টি কবিতা	*সমীর রায়ের*
আসবেই জোয়ার	শ্রীমতী আরতি কুণ্ডু
অপরাহ্নের আলাপন	সুকান্তি দত্ত
সমাজ ও রুজি	অসিত মুখোপাধ্যায়
কথায় কথায়	বেলা বসু
ছিঃ	জয়ন্ত সোম
ক্যাকটাস ও শান্তিনিকেতন	অঞ্জন কর
এপিটাফ	অনির্বাণ ভট্টাচার্য্য
জীবন-যাপন	সৈয়দ ইমদাদ হোসেন
বসন্ত	প্রাণকৃষ্ণ কৈবর্ত্ত্য
অ থেকে অং	বর্ণমালার যাদুশালা আয়েশা খাতুন
খারাপ ছাত্রীরা	বনানী দাস
শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে —“শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা”	ঝুমা মুখার্জী
বর্তমান উচ্চশিক্ষার প্রতিবিম্ব	অরূপ কুমার মৈত্র
প্রাথমিক শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি ও দিশা	প্রকাশ পারমার

রবীন্দ্রনাথের গান

পুলক দত্ত

আমাদের বয়সী বাঙালিরা ছোটবেলা থেকে একটা কথা শুনে অভ্যস্থ: আমাদের জীবনে এমন কোনো অভিজ্ঞতা নেই যা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধেন নি। আরেকটি কথাও শোনা যেত, যদিও তুলনায় অনেক কম : যে-কোনো পরিস্থিতিতে, যে কোনো সংকটে রবীন্দ্রনাথের গান আমাদের শক্তি যোগায়; প্রস্তুত করে সত্যের মুখোমুখি হতে। আমরা অনেকেই লক্ষ করেছি ঋতু পরিবর্তনে, আনন্দে-বেদনায়-বিরহে-মিলনে কত সহজেই উঠে আসে রবীন্দ্রনাথের গান; নিঃশব্দে যুক্ত করে আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে, আভাস দেয় কোনো বড় সত্যের। এই অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও প্রশ্ন থেকেই যায়, সত্যিই কি রবীন্দ্রনাথের গান ছুঁতে পারে আমাদের অভিজ্ঞতার সমস্ত স্তর? এমনকি তাঁর যুগেও কি তাঁর গান ছুঁতে পেরেছিল বিশেষ করে নাগরিক মনের সূক্ষ্ম আর নতুন অভিজ্ঞতা?

আরেকটি কথাও মনে হয়েছে বহুবার: গভীর কোনো বিচ্ছেদের মুহূর্তে কি শান্ত মনে মৃত্যুকে গ্রহণ করতে পারার শক্তি যোগাতে পারে রবীন্দ্রনাথের গান? প্রশ্নটা স্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে নয়, আকস্মিক মৃত্যুকে ঘিরে। রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনে যখন একের পর এক মৃত্যুর আঘাত পার হয়েছেন, আরো অনেক কিছুর সঙ্গে গান বাঁধাও তখন হয়েছে তাঁর এই 'পার হওয়ার' প্রক্রিয়ার অঙ্গ। আমাদের মত সাধারণ মানুষের পক্ষে কি তা সম্ভব? ব্যক্তিগত জীবনে সত্যিই যখন এল এমন মুহূর্ত—যে মানুষের সঙ্গে রাত্রিবেলায় আড্ডা মারলাম, পরের দিন মেঘলা ভোরে সেই বন্ধুকেই দেখলাম হাসপাতালে কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করে চোখের মণি স্থির করে শান্ত হয়ে যেতে অথবা যে সহকর্মির সঙ্গে সকালে কথা হল, সেই বন্ধুকেই দুপুরে স্নান করা চুলে, দাড়িকাটা গালে শ্বাসহীন শুয়ে থাকতে দেখলাম হাসপাতালে—সেই মুহূর্ত, যখন শরীর হয়ে আসে আলগা, ভেঙে যেতে থাকে প্রচলিত সম্পর্কের গড়ন, তছনছ হতে থাকে বিশ্বাসের জগৎ, রবীন্দ্রনাথের গান কি পারে আমাদের সেই মুহূর্তের কাছাকাছি নিয়ে যেতে? ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় জানি, পারে। দিনের পর দিন বন্ধুরা মিলিত হয়ে যখন এই মুহূর্তকেই করতে চেয়েছি জীবনের অঙ্গ, ভিজে চোখে একটার পর একটা রবীন্দ্রনাথের গানই উৎসারিত হয়েছে তখন আমাদের ভিতর থেকে। এও লক্ষ করেছি যে সেই গান ছিল না শুধুই মৃত্যুর গান; ছিল প্রকৃতির গান, প্রেমের গান, মানুষের গান, যে বন্ধুরা চলে গেলেন তাঁদের পছন্দের গান।

গান শোনা

গান বলতে কি বুঝি আমরা, কী শুনি? চোদ্দ-পনেরো বছরের একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রকে একবার মহা উৎসাহে পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রেকর্ড শুনিয়েছিলাম। শুনে সে বলেছিল, 'মনে হচ্ছে চ্যাপলিনের সিনেমা দেখছি।' আর একজন 'উচ্চশিক্ষিত' মধ্যবিত্ত বাঙালি একবার রেকর্ডে এসরাজ শুনে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কেউ মরেছে নাকি?' গান বা সঙ্গীতকে সুর তালের বাইরে অন্য কোনো অনুষঙ্গে শোনার অশিক্ষিত অভ্যাস থেকে আজও বাঙালি মুক্ত হতে পারে নি।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনার ধরনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখা যাক। বছর কয়েক আগে শঙ্খ ঘোষের *দামিনীর গান* (প্যাপিরাস,

কলকাতা, ১৪০৯/২০০২।) বলে একটা বই পড়েছিলাম। ভূমিকার শুরুতেই এইরকম একটি ঘোষণা ছিল, 'এ বইটিতে যে লেখাগুলি আছে, তার প্রধান ভর রবীন্দ্রনাথের গান, কোনো কোনো গান।' গোটা বইটা পড়ে ফেলার পর বুঝলাম আমরা সাধারণত গান বলতে যা বুঝি, বইটি সেই বিষয়ে লেখা নয়। বইটির আলোচ্য বিষয় কেবলগানের কথা, অথবা গানের কথার ওপর ভর করে লেখা আরো অনেক 'কথা' আর ভাবনার কথা। এর বারো বছর আগে লেখা একই লেখকের আরেকটি বইও রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে লেখা বলে পরিচিত। সেই বইয়ের ভূমিকা ছিল একটু অন্যরকম, 'রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের এই সংকলন। গানের সুর নয়, এ-লেখাগুলির প্রধান লক্ষ্য গানের কথা'। (*এ আমির আবরণ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮০) এই বইটি যাঁকে উৎসর্গ করা হয়েছে সেই আবু সয়ীদ আইয়ুব তারও সাত বছর আগে লিখেছেন, 'রবীন্দ্র সঙ্গীতে সুরের শিল্পোৎকর্ষ ও ব্যঞ্জনাশক্তি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নেই, তবু বলব সুর সেখানে রথ, সারথী নয়, কথার সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা ও আদিগন্ত বিস্তার হৃদয়ের গভীরে পৌঁছে দেওয়া তার কাজ'। (*পান্থজনের সখা*, দে'জ, কলকাতা ১৯৭৩। পৃ. ১১) রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতা প্রসঙ্গে অমিত চৌধুরী তাঁর 'The Flute of Modernity' প্রবন্ধে রবীন্দ্রসঙ্গীতে 'কিছু' শব্দের ব্যবহারের সাহিত্যিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত,

> ...Tagore's most enduring creative legacy to the Bengali bourgeoisie was both epic-like and yet not an epic, a gift of songs in which the consciousness of Bengali modernity first found utterance and in which the impress of its creation and history was subliminally contained, while relinquishing the overarching narrative of the epic for lyric moments of implication and inquiry. (*The New Republic*, October 19, 1998. p.46)

রবীন্দ্রনাথের গানের সাঙ্গীতিক কাঠামোয় তাহলে কি 'আধুনিকতা'র কোনো চিহ্ন নেই? বাঙালি আধুনিক মন প্রতিফলিত হল না তাঁর গানের সুরে? ঘটনাটা এমন নয় যে কেবল মাত্র কয়েকজন চিন্তাশীল, প্রভাবশালী রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ এইভাবে শোনেন রবীন্দ্রনাথের গান—এই ভাবে রবীন্দ্রনাথের 'গান' শোনার অভ্যাস আছে আমাদের অনেকেরই। গানের লয়-ছন্দ-সুর-তাল এখানে খানিকটা ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের মতন। রবীন্দ্রভাবনায় গানের গঠনকৌশলের যেন কোনো বিবর্তন নেই, নেই কোনো দর্শন। অবনীন্দ্রনাথ যেমন একবার বলেছিলেন বলে আমরা শুনেছি, 'যা পার, যেমন তেমন করেই গাও না; কথাগুলি একবার শুনি।'

এইভাবে গান 'পড়া' এবং গান বিশ্লেষণ করার প্রবাহ সাম্প্রতিক কালে রচিত গান আলোচনাও অব্যহত। 'গান'কে শুধুমাত্র কথা আর বিষয় দিয়ে বিচারের সমস্যা অনেক। একটি প্রবন্ধে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত বাঙলা ব্যাণ্ড 'মোহিনের ঘোড়াগুলি'র'ভালোবাসি পিকাসো বুনুয়েল দান্তে/বীট্‌লস্ ডিলান আর বেটোফেন শুনতে / রবিশঙ্কর আর আলি আকবর শুনে/ ভালো লাগে ভোরে কুয়াশায় ফিরতে' সম্বন্ধে অভিষেক গাঙ্গুলি লিখছেন,

> Keeping the intellectual predicament of the urban folk singer in mind, we can see a conscious attempt to coalesce the local with global cultural modernity in these lyrics, but the evocation of the nightly concert in particular produces the familiar spacialised locality of the annual Dover Lane Music Conference among other things, a place where the musical preferences of Calcutta are still shaped and nurtured. ('Citybeats: Urban folk music in late-modern Calcutta', *Sarai Redear* 02, Delhi/Amsterdam, 2002.p.54)

খুবই আশ্চর্যের কথা নয় কি? 'cultural modernity', 'spacialised locality', 'late-modern' কথাগুলির মানে যাই হোক না কেন, এই বৈশিষ্ট নাগরিক শ্রোতারা খুঁজে পাবেন কেবল মাত্র গানের কথায়! এমনকি লোকাল আর গ্লোবালের সচেতন মিলন হল বেটোফেন-রবিশঙ্কর-আলি আকবর নামগুলি পাশাপাশি উচ্চারণ করে, এই যুক্তি কি হাস্যকর নয়? প্রশ্নগুলো জরুরি এই জন্যই যে বাঙলা ব্যাণ্ড মিউজিক বলে পরিচিত যে সঙ্গীতচর্চা— বিভিন্ন ধরনের নেশায় ডুবে

যাওয়া, ড্রামারের সঙ্গে লীড সিঙারের প্রেম, সুর গঠনের কৌশল, বাণিজ্যিক সাফল্যের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দলের মধ্যে ভাঙন, ছন্দের ব্যবহার, পোশাক, ব্যবহৃত সাঙ্গীতিক যন্ত্র, চুলের রঙ আর ঢঙ ইত্যাদি— তার ভাষাটুকু ছাড়া আর প্রায় সবটাই ধনী দেশ থেকে আমদানি করা। ব্যাপারটা খানিকটা এই রকম : মাইক্রোসফটের অপারেটিঙ সিসটেম, তাদেরই তৈরি ডিজাইন, কম্পিউটারের জগতে চলাফেরা করার ছন্দ তাদের, এটির বিক্রিলব্ধ টাকাও তাদের— শুধুমাত্র যন্ত্র যখন খুলল তাতে Windows-র বদলে লেখা হল 'জানালা! এই ধরনের কথা বলে আগে অনেকেই 'reactionary' বলে গালি খেয়েছেন, তবুও এখনও এই কথাগুলি বলা জরুরি এই জন্য যে, নতুন যুক্তি আবিষ্কার করে গোটা ভারতীয় সঙ্গীতের সমৃদ্ধ ভাণ্ডারকে কেবলমাত্র 'কথা'য় নামিয়ে আনার যে রাজনীতি তা যে-কোনো সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের জন্য ক্ষতিকর। রবিশঙ্কর-আলি আকবর-জাকীর হুসেন, এঁদের নাম আসে যাঁদের গানে, দাদরা-কাহারবা ছাড়া অন্য কতগুলি তালে গান বেঁধেছেন এঁরা? যে-পদ্ধতিতে সুরসৃষ্টি করেন ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞরা তার কোনো প্রয়োগ কি এই ধরনের গানে আছে?

সাহিত্যের ভাষার সঙ্গে রূপের ভাষার, সে শব্দরূপই হোক কি দৃশ্যরূপ, মূলগত কিছু প্রভেদ আছে। উপরিউক্ত লেখকদের আলোচনার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, শব্দরূপের ধর্ম, ভাষা, চরিত্র ও আচরণ সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবেই তৈরি হয় 'গান'-এর এই ধরনের সাহিত্যনির্ভর বিবরণধর্মী আলোচনা। রণজিৎ গুহর ছয় ঋতুর *গান* (চর্চাপদ, কলকাতা, মে ২০০৯) এই ঘরানারই অতি সাম্প্রতিক সংযোজন। সবথেকে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করেন বলেই শব্দরূপের আলোচনাকে এঁরা সাহিত্যের অথবা সমাজবিজ্ঞানের আঙিনায় নামিয়ে এনে সেই অনুযায়ী ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেন। এ-সমস্যা আজকের যুগে শিল্প-সঙ্গীত সংক্রান্ত সমালোচনামূলক সাহিত্যের একটি সাধারণ ও গ্লোবাল সমস্যা। আর তারই প্রভাবে গোটা বিশ্বেই সাম্প্রতিক শিল্প ও সঙ্গীতচর্চা হয়ত হয়ে উঠছে অনেক বেশি সাহিত্য ও অনুষঙ্গ নির্ভর। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির জগৎকে সমগ্রতায় স্পর্শ করতে হলে সাহিত্যনির্ভর চিন্তার কাঠামোকে ভেঙে বেরোনোটা একেবারেই আবশ্যিক। আর সেই চিন্তার কাঠামোকে ভেঙে বেরোনোর আয়োজন প্রয়োজনের তুলনায় হয়েছে অনেক কম।

গান পড়া ও গান দেখার বাইরেও যিনি গান শুনতে জানতেন সেই ধূর্জটিপ্রসাদের শেষ বয়সের রবীন্দ্রসঙ্গীত ভাবনাটা এই রকম। আবু সয়ীদ আইয়ুব অথবা অবনীন্দ্রনাথের যেন ঠিক বিপরীত প্রান্ত।

> রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণ কথার মাধুর্য নয়, কথা ও সুরের সঙ্গতিও ততটা নয়, যতটা গানটির ডিজাইন। কথা বাদ দিয়ে কেবল স্বরবর্ণের সাহায্যে সুরটি গাইলেই বোঝা যায়। অবশ্য কথা অতুলনীয়, সঙ্গতিও অচ্ছেদ্য, তবু তার অধিক হল ডিজাইন, যেটা ধারণ করছে, অর্থাৎ ধর্ম। ... রবীন্দ্রনাথের প্রতিটি গান এক একটি 'ডিজাইন', সেইটিই কাঠামো, সেইটিই এক্সপ্রেশন। তার ওপর এক্সপ্রেশন চাপালে বিপদ ঘনিয়ে ওঠে। (*মনে এলো*, ধূর্জটিপ্রসাদ রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, দে'জ, কলকাতা, ১৯৮৭। পৃ. ১২৩-১২৪)

যাঁরা গান করেন ও গান-সুর-সঙ্গীত রচনা করেন সেই সৃষ্টিশীল মানুষদের কাছে এই ভাবনাই বেশি যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য। সুরকার সত্যজিৎ রায় যেমন বলেছেন,

> সত্যি বলতে কি — আজকাল যা হচ্ছে, তাতে সাধারণের বাজারে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কোনো ভবিষ্যৎ আছে কিনা সন্দেহ। সাধারণের কাছে এ গানের মূল্য কিছুমাত্র আছে বা থাকতে পারে বলে মনে হয় না; আর যুগটাও যে পালটেছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রোত্তর যুগে রবীন্দ্রসঙ্গীত বেঁচে থাকতে পারে কেবল তার সুর আর ছন্দের জোরে এবং যেটার আসলে দরকার সেটা হল এই দুটো দিককে উপযুক্ত সংগতে আরো সমৃদ্ধ করা। ('রবীন্দ্রসঙ্গীতে ভাববার কথা', এক্ষণ, কলকাতা, ১৩৭৪।১৯৬৭)

গান শেখা গান গাওয়া

আমাদের দেশের প্রায় সব ধরনের সঙ্গীতশিক্ষাই শ্রুতিনির্ভর। তার প্রধান কারণ এই যে আমাদের দেশের কোনো সঙ্গীতই একটি বিশেষ রচনার হুবহু অনুকরণ নয়। সঙ্গীতশিক্ষার অর্থ সঙ্গীতসৃষ্টির শিক্ষা। গুরুর কাছে এই শিক্ষাই প্রধানত পেয়ে থাকেন শিষ্যরা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতই হোক কি কীর্তন কি বাউল, সব ক্ষেত্রেই অনায়াসে সুরের, তালের, গানের প্রকৃতি অনুযায়ী স্বরবিন্যাস, ছন্দ আর লয়ের সৃজনশীল প্রয়োগের শিক্ষাই সঙ্গীতশিক্ষা। এই সঙ্গীতের, যেখানে সঙ্গীতস্রষ্টা ও সঙ্গীতশিল্পী অভিন্ন, শিক্ষাপদ্ধতির বিশেষ একটি দৃষ্টান্ত দেখলেই এর চরিত্রের একটা সন্ধান পাওয়া যাবে। নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে একটি সাক্ষাৎকারে বলছেন,

> খণ্ডমেরু জিনিসটা যেমন একটি ভয়ানক দরকারি জিনিস, যে জিনিসটা, আমার মনে হয় প্রত্যেক গাইয়ে-বাজিয়ের বেশ ক'য়েক বছর শিক্ষা করা উচিৎ। যেমন সা-রে-গা-মা-পা-ধা-নি, এই সাতটা স্বরে ৫০৪০ টা নানা রকম প্যাটার্ন.হয়। ...গোড়ার দিকে প্রচুর রেওয়াজ করতে হয়, করতে করতে দেখা যায় এ এক বিশাল সমুদ্র—এর কোনো শেষ পাওয়া যায় না। ... একটা তান আর এক রকম শোনায় না, তাকে নানা ভাবে, তার বৈচিত্র করা যায়।
>
> ... এই রেওয়াজের অনেকরকম প্রক্রিয়া আছে, যেমন একটা সিধে হিসেব হল, ১-২-৩-৪-৫ বা সা-রে-গা-মা-পা ... কত রকম ভাবে তাকে করা যায়, অর্থাৎ ১-২-৩-৪-৫, ১-৩-২-৪-৫, ৫-৩-৪-২-১, ১-৪-২-৫-৩, এটা হচ্ছে প্রথম স্তর... তারপর ৫টা থেকে ৬টা স্বর নিয়ে, তার পর ৭টা স্বর নিয়ে... দেড় অকটেভ নিয়ে, দু অকটেভ নিয়ে...। (নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাক্ষাৎকার, সোমনাথ সান্যাল, আকাশবাণী, কলকাতা। মেরু, খণ্ডমেরু ও মাতৃকার বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য, Amiya Nath Sanyal, 'Examination of Specimens by Means of the Relation of Notes' *Ragas and Raginis*, Orient Longmans Private Limited, Calcutta, 1959)

অনুমান করা কঠিন নয় যে প্রত্যেকটি স্বরবিন্যাসই অন্যটি থেকে স্বতন্ত্র। মানুষের অভিজ্ঞতার বিভিন্ন সূক্ষ্ম অনুভব, ভাব ইত্যাদির যে সীমাহীন ক্ষেত্র, খণ্ডমেরুর গভীর সাধনা তার প্রতিটি স্তরকে সাঙ্গীতিক রূপ দিতে সক্ষম—এমন ভাবাও খুব অযৌক্তিক নয়।

রবীন্দ্রনাথের গান, যেখানে গাইয়ে গানের স্রষ্টা নন, সে-শিক্ষার পদ্ধতিও ভিন্ন। যে-সুরে, তালে যে-গান বাঁধা আছে তাকে সেই ভাবেই গাইবার কথা। কেমন সেই শিক্ষাপদ্ধতি? ছোট থেকে এই গান আমরা তো শুনেই শিখি। হয় কোনো শিল্পীর কাছ থেকে অথবা সাম্প্রতিক কালে, রেকর্ড শুনে। পেশাদার শিল্পী অথবা শিক্ষক ছাড়া আমরা কেউই প্রায় স্বরলিপি থেকে গান শিখি না—স্বরলিপি পড়তেও জানি না। রবীন্দ্রনাথের গানের এমন প্রকৃতি যে স্বরলিপি করে সেই গানের সংরক্ষণ সম্ভব। আমরা এও জানি যে রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই ব্যাপারে অতিরিক্ত তৎপর ছিলেন। আমাদের দেশের সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে স্বরলিপির আবির্ভাব খুব প্রাচীন নয়। ঐতিহাসিক সত্য হল এই যে স্বরলিপি মূলত সাহায্য করেছিল আমাদের গানের শ্রোতা তৈরি করতে। স্বরলিপির মাধ্যমেই সাধারণ মানুষ প্রবেশ করতে পেরেছিলেন শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের জগতে। কোনো শাস্ত্রীয় শিল্পীই প্রায় স্বরলিপিকরণের পক্ষে ছিলেন না। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্‌স্ 'On the Musical Modes of the Hindus' বলে একটি প্রবন্ধের খসড়া লেখেন। এই লেখাটি পরবর্তিকালের অনেক লেখককে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। জানকী বাখলে জানাচ্ছেন,

> Jones was followed by a succesion of other colonial authors who augmented his theory by producing, over the course of nineteenth century, a canonic understanding of what Indian music needed in order to religion. These colonial authors invariably assumed the presence of all three in the Western context as evidence of aesthetic and organizational superiority. Notation, they argued, would remove inconsistency and enable music to be

⊗ become genuinely classical. According to these writers, music needed three things: nation, notation and

> read off the page, as was the case with Western classical music. However, Indian music was predicated on the very opposite of faithful duplicability, and as a result, notation did not make the inroads it was expected to make. Similarly, Jones's theory about the natural inextricability between the music and the religion of the nation of "Hindoos" suffered when subjected to serious scrutiny. (*Two men and Music : Nationalism in the Making of an Indian Classical Tradition*, Oxford University Press, New York, 2005. pp.10-11)

সাধারণভাবে দেখলে, এই গানের প্রকৃতি এমন যে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী-শিক্ষক, স্বরলিপি, রেকর্ড আর তাঁর নিজের সৃষ্ট গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছু নির্দেশ—এর বাইরে রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার জন্য আর তো কিছুর প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ গলার সুর থাকলেই এই গান গাওয়া সম্ভব। এমন ভাবনা যে কিছুটা সত্য তার প্রমাণ এই যে এমন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী আমরা দেখেছি যাঁদের জন্য তবলিয়া অথবা এসরাজীকে তানপুরা বেঁধে দিতে হয়; সু-বিনয়ী কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গের গানের সম্পূর্ণ তেজহীন, পৌরুষহীন, অতি তরলিকৃত উপস্থাপনা শোনার দুর্ভাগ্যও আমাদের অনেকেরই আছে। কিন্তু সত্যিই কি ঠিক সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারাই যথেষ্ট?

রবীন্দ্রসঙ্গীত থেকে সুরকে আলাদা করে দেখলে যেমন তা আর গান থাকে না, তেমনি কথা বা তালের ওপর ঝোঁক বেশি পড়লেও সেটা আর গান থাকে না। 'আমি বলে 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই', 'এই লাইনটায় 'বলে'টা যদি 'বলি' হতো, তাহলেই ভেঙে যেত গোটা গান' (*দামিনীর গান*, পৃ. ৭৬) যেমন সত্যি তেমনই সত্যি গাইবার সময় বুঝে নেওয়া যে এই লাইন গোটা গানটায় থাকতে পারে কেবল অন্তরার শেষ লাইন হিসেবেই— যার পরেই গলা ফিরে আসবে 'মেঘ বলেছে 'যাব যাব''তে। 'ভুবন বলে, 'তোমার তরে আছে বরণমালা'য় 'আছে বরণমালা'র যে গড়ানো সুর তাকে অনেক আদরে যত্নে গাইলেই তো মনে হয় গাওয়া হল। 'ধরণীর গগনের মিলনের ছন্দে' গানে 'ছন্দে' কথাটার সুরে যে দুলুনি সেইটা সমস্ত শরীরে-মনে দোলা না দিলে মিলন যেন অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 'ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর' আর 'দূরে কোথায় দূরে দূরে' সম্পূর্ণ ভিন্ন সুর, 'সুদূর' আর 'দূর'-এর সুরই আমাদের বাস্তব, সাহিত্যিক, বর্ণনামূলক দূরত্বের থেকে আরো দূরে, আরো গভীরে নিয়ে যায়।

কথা যখন সঙ্গীতে প্রকাশিত হয় তখন তার কাঠামোর মধ্যে ভাব অনুযায়ী ঘটে যায় এক বিরাট বিপ্লব। 'নিবিড় ঘন আঁধারে জ্বলিছে ধ্রুবতারা', গানে এসে হয়ে যায়, নি বি ড়। ঘ ন। আঁ - ধা রে। জ্ব লি ছে। ধ্রু ব। তা-রা-।, অথবা 'জাগে নাথ জোছনারাতে,' হয়, জা-। -গে-। না- -থ। জো - -। ছ না - -। - রা-। - - তে -। - - -। এই জা থেকে গে-তে পৌছনোর মধ্যবর্তী কাল হয়ে ওঠে গভীরভাবে অর্থবহ। আর এই গান বাঁধা আছে তেওড়া, রূপক বা দীপচণ্ডীতে নয়, ধামারে—যে তালের ভাষায় বিশ্রামের এই যাদু আছে। ক ধে টে ধে টে। ধা-। গ দি ন। দি ন তা -। 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একি দুর্দিন-' গানের মূল শক্তিই তো লুকিয়ে আছে এর শব্দের ধ্বনি আর সুরফাঁকতালের ওই বিশেষ ৪। ২। ৪ কাঠামোর আর বাণীর তেজের মধ্যে। 'লহো লহো তুলে লহো নীরব বীণাখানি' ৩। ২ । ২ সাত মাত্রার তালে না গেয়ে যদি ৪। ৪ অথবা ৩। ৩ ছন্দে গাওয়া হয় অথবা ঢালা গাওয়া হয় তাহলে যে গানটার ভাবটাই মরে যায় সেইটুকু বোধ না থাকলে এ গান গাইব কি করে?

ঠিক সুরে গাইতে পারাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের পক্ষে যথেষ্ট নয়। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের মতনই এই ক্ষেত্রেও দেখা যাবে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষক পণ্ডিত আর তাত্ত্বিকরাই স্বরলিপির ব্যাপারে সবথেকে বেশি তৎপর। শিল্পীরা কিন্তু অতটা গোঁড়া নন এই ব্যাপারে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের শুদ্ধতা রক্ষার ভার যাঁরা নিজে নিজে নিয়ে বসে আছেন, তাঁরা প্রত্যেকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত বলতে আলাদা আলাদা জিনিস বোঝেন, এ-কথা প্রমাণ করা কঠিন নয়। ফলে স্বরলিপি আঁকড়ে থেকেও ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষকের ক্ষেত্রে গানের চরিত্রও বদলে যায়। যে-সব কবি-সাহিত্যিক, রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ এই গান সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, তাঁদের পক্ষেও কি সম্ভব এক মত হওয়া? অন্যদিকে শিল্পীরা অতটা গোঁড়া নন তার প্রধান কারণ হল এই বোধের উন্মেষ

② become genuinely classical. According to these writers, music needed three things: nation, notation and

যে রবীন্দ্রনাথের গান আসলে অংশগ্রহণের গান, যুক্ত হবার গান—এই বোধই এই গানের মূল চালিকাশক্তি। সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে আরেকটি অত্যন্ত জরুরি কারণ এই যে পেশাদার শিল্পীকে শিক্ষক অথবা স্বরলিপির থেকে অনেক বেশি নির্ভর করতে হয় বাজারের ওপর।

রবীন্দ্রনাথ

আমাদের দেশের গ্রামে এখনও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে মেলা বসে। এই ধরনের মেলায় গ্রাম সমাজের সংঘশক্তি, লোকশক্তি ও দেশজ সংস্কৃতির প্রকাশ খুবই স্পষ্ট। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে সব যুগেই সংস্কৃতিচর্চাকে সকল মানুষের বিচরণক্ষেত্র করে তোলার একটি বিশেষ প্রবাহ লক্ষ করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই ধরনের গণমণ্ডল আজও সক্রিয়। আমাদের গ্রামে মেলা আর উৎসবে আজও এই ধারা প্রবাহিত। প্রাক্‌আধুনিক আধুনিক-উত্তরআধুনিক, নাগরিক চিন্তার এই কাঠামো দিয়ে এই সংস্কৃতিচর্চার মর্মে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। অনাধুনিক এই সংস্কৃতিচর্চা আধুনিক-উত্তরাধুনিক সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি সমানভাবে সচল, সজীব ও পরিবর্তনশীল।

১৯০৪ সালে লেখা 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, 'এই মেলায় আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান করে... মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়া আসে।' রবীন্দ্রনাথ শুধু এইটুকুই লক্ষই করেননি, নিজের কর্মক্ষেত্রে এই 'আহ্বান' আর 'হৃদয় খুলিয়া' আসার সংস্কৃতিচর্চার আয়োজনও করেছিলেন, এ-কথা আমাদের জানা। শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্যে সংঘশক্তি ও দেশজ সংস্কৃতির প্রকাশ সবথেকে বেশি নজরে আসে এখানকার উৎসবে আর মেলায়। একদিকে আহ্বান আর অন্যদিকে প্রাণ খুলে মিশে যাবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই ক্ষেত্রেই সবথেকে বেশি। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথের গান এই ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। একসঙ্গে গান করা আর একসঙ্গে গান শোনা, দুটিই বাধাহীনভাবে মানুষের সঙ্গে, প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে যাবার প্রকৃষ্ট উপায়। আরেকটি ঘটনাও স্বাভাবিক ভাবেই এই সঙ্গীতচর্চার অঙ্গ হতে পারত—একসঙ্গে গান বাঁধা। এই ঘটনা শান্তিনিকেতনে ঘটেনি। রবীন্দ্রনাথ এখানে একাই গানস্রষ্টা। জ্ঞানসৃষ্টি অথবা শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা এই রকম ঘটেনি শান্তিনিকেতনে।

যে-গান শুধুই ভোগ করার 'বস্তু' নয়, প্রশ্নহীন সমর্পণ যার উদ্দেশ্য নয়, সেই মিলিত হবার গানের সুর সৃষ্টি করতে রবীন্দ্রনাথ কোন নির্মাণ-কৌশল ব্যবহার করলেন, বুঝতে ইচ্ছে করে। বাংলা কীর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা আমাদের সকলের জানা। তাঁর নিজের কথায়, 'বাংলা সঙ্গীতের বিশেষত্বটি যে কী তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে তো অবিমিশ্র সঙ্গীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্যরসের আনন্দ একাত্ম হয়ে মিলিত।' এছাড়াও কীর্তনই এক সময় বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল। কীর্তনের নানান রূপের সৃষ্টি— নামগান, পালাকীর্তন, মনোহরসাহী, ঢপকীর্তন ইত্যাদির পিছনেও হয়ত সেই একই কারণ। গানকে সকলের করে তোলার জন্য বাঙালির কাছে এই রূপই হয়ত সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য। হৃদয়াবেগ, কাব্যরসের আনন্দ, জটিল তত্ত্বের বিস্তারিত ব্যাখ্যা, নাট্যরস, শ্রোতার সঙ্গে কথোপকথন, সুর ও তালের যথাযথ ও সাঙ্গীতিক প্রয়োগ—এই সবই একসঙ্গে পাওয়া যায় বাঙলার সঙ্গীতের এই বিশেষ রূপটিতে। আর তাই শান্তিনিকেতনের আদর্শ, সমাজ জীবন, উৎসব-অনুষ্ঠানের সঙ্গে কীর্তনের চলন ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে গান রচনায় রবীন্দ্রনাথের কি কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না? যতদূর জানি কোনো সঙ্গীতের ধারাতেই রবীন্দ্রনাথের ধারাবাহিক কোনো তালিম ছিল না। সুর রচনায় যাঁদের একটুও অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা বিস্মিত হবেন এই ভেবে যে কোনো ধারাবাহিক তালিম ছাড়াই কীভাবে এতগুলি অসামান্য সাঙ্গীতিক রচনা সৃষ্টি করলেন রবীন্দ্রনাথ। আমাদের মনে পড়তে পারে মৌজুদ্দিনের কথা, শুনেছি রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতেন এই খেয়াল ঠুংরি, ওস্তাদের গান। শ্যামলালজী বলছেন, 'আর মৌজুদ্দিনের সঙ্গেও আলাপ করে দেখো। সে না জানে রাগ কাকে বলে, না জানে তাল, অথচ রাগ ও তালে গান করে।

মাত্র একবার শুনেই গোটা একটি গান আয়ত্ত করে ফেলে। লজ্জার কথা বাইরে প্রকাশ করব কি! মৌজ্‌দিন রেখব-গান্ধার জানেনা। ওকে কখনও সারগম করতে শুনবে না।' আর ওই 'সরল শিশুর মত ব্যক্তির' সঙ্গে গল্পগুজব করে অমিয়নাথ সান্যাল বুঝতে পারলেন, 'মৌজ্‌দিন রাগ-তাল জানেন না, শিক্ষাও করেননি, সারমগও সাধেননি। ঠিক যেমন হাঁসের বাচ্চাকে জলে ছেড়ে দিলে সে আপনি সাঁতার কাটে, খেলা করে, মৌজ্‌দিনও সে রকম গান করেন, রাগে ও তালে।' (স্মৃতির অতলে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৪০৫। পৃ. ২১) এই সূত্রে মনে পড়ে আরেকটি দলের কথা—বীট্‌ল্‌স্‌। তাঁদের চারজনেরও কোনো সাঙ্গীতিক তালিম ছিল না। অথচ তাঁদের অনুষ্ঠান শুনতে আসতেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞরা, লক্ষ করতেন ঠিক কী ধরনের কর্ড ব্যবহার করছেন তাঁরা।

রবীন্দ্রনাথ শুধু গান রচনাই করেন নি, সমকালীন গানবাজনা সম্বন্ধে নিজের বক্তব্য ব্যক্ত করেছেন অজস্র রচনায়। ৫ সেপ্টেম্বর ১৯১৭ বিচিত্রা সভায় রবীন্দ্রনাথ পাঠ করেন তাঁর সঙ্গীত বিষয়ক প্রবন্ধ 'সঙ্গীতের মুক্তি'। আমার এই লেখায় তার দুটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করব। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> ব্যবসায়ী জানে যেটা জানা সহজ নয়, অর্থাৎ নাড়ি-নক্ষত্র। আর অব্যবসায়ী জানে যেটা জানা নিতান্তই সহজ, অর্থাৎ হাব-ভাব চাল-চলন। ... এই নাড়ি-নক্ষত্র জানাটাই প্রকৃত জানা এমন একটা অন্ধসংস্কার সংসারে চলিত আছে।
>
> আনাড়ির মস্ত সুবিধা এই যে, সানাড়ির চেয়ে তার অভিজ্ঞতার সুযোগ বেশি। কেননা পথ একটা বই নয় কিন্তু অপথের সীমা নাই; সে দিক দিয়া যে চলে সেই বেশি দেখে, বেশি ঠেকে। আমি পথ জানিনা বলিয়াই হোক কিম্বা আমার মনটা লক্ষ্মীছাড়া স্বভাবের বলিয়াই হোক, এতদিন গানের ঐ অপথ এবং আঘাটা দিয়াই চলিয়াছি। সুতরাং আমার অভিজ্ঞতায় যাহা মিলিয়াছে তাহা শাস্ত্রের সঙ্গে মেলে না।
>
> আমরা শাসন মানিব, তাই বলিয়া অত্যাচার মানিব না। ... যে নিয়ম ওস্তাদের [অর্থাৎ যিনি নাড়ি-নক্ষত্র শিক্ষা করেছেন] তাহা আমার ভিতরে নাই, বাইরে আছে, সুতরাং তাকে অভ্যেস করিয়া বা ভয় করিয়া বা দায়ে পড়িয়া মানিতে হয়।

নাড়ি-নক্ষত্র জানা আর হাব-ভাব, চাল-চলন জানাকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখায় গোলযোগ তৈরি হয়েছে অনেক। নিজেকে আনাড়ির দলে ফেলে রবীন্দ্রনাথ এমনই একটি মত প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে আনাড়িদের পক্ষেই সম্ভব সঙ্গীতের মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধ অবলম্বনে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ বেদান্ত চিন্তামণি একটি প্রবন্ধ লেখেন। ('হিন্দু সঙ্গীতের স্বাতন্ত্র্য ও সংযম এবং পুজ্যপাদ কবি স্যার শ্রীরবীন্দ্রনাথ', *নারায়ণ*, পৌষ ১৩২৪ (১৯১৭) ভারতীয় সঙ্গীতের ভবিষ্যৎ নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্‌বেগ এই লেখায় পরিস্কার। তিনি লিখছেন,

> 'সঙ্গীতের মুক্তি!' বিষয়টি গুরুতর। গুরুতর বলিয়াই মনে হয়, প্রবন্ধটি দুরূহ। ... রবীন্দ্র বাবু তাঁহার প্রবন্ধমধ্যে সঙ্গীতের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধে এমন দুই চারিটি অবশ্য মীমাংসিতব্য প্রশ্ন তুলিয়াছেন যে, যদি সেগুলির শাস্ত্রসঙ্গ ত মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে আজ না হয় কাল, প্রতীচ্য-কল্পনা-প্রসূত Romantic Movement এর প্রবল বন্যায় আমাদিগকে নিশ্চয় দেহ ভাসাইয়া দিতে হইবে। ... তখন নিজেদের নিজস্ব-ব্যক্তিত্ব-বিশেষত্ব হারাইয়া আমাদিগকে তাহাদের হস্তে মৃৎপিণ্ডের মত থাকিতে হইবে।

রোমান্টিক মুভমেন্ট হোক বা আর কিছু, প্রতীচ্য-কল্পনা -প্রসূত ভাবনায় যে আমাদের দেহ ভেসেছে, নিজত্ব-ব্যক্তিত্ব-বিশেষত্বর অবস্থান যে আমাদের চেতনার একেবারে প্রান্তে গিয়ে পৌঁছেছে, সে কথা কি আজকের বাংলা গান প্রমাণ করে না? এই প্রসঙ্গে সাধারণভাবে 'আমাদের আধুনিকতা' বিষয়ে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ।

> ...বিশ্বজনীন আধুনিকতার প্রাঙ্গণে আমরা ব্রাত্য, চণ্ডাল। আমাদের কাছে সে আধুনিকতার মানে বিদেশি জিনিসের ফ্যান্সি মার্কেট। ... আধুনিকতার উৎপাদক হিসেবে সেখানে কেউ আমাদের পোঁছে না। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে ভাবলে যা নিদারুণভাবে সত্য, তা হল আমাদের অধীনতা, আমাদের নিষ্ক্রিয়তা। কিন্তু আমরা

> আধুনিক হতে চাই বলেই আমাদের স্বাতন্ত্র্য জাহির করার ইচ্ছা, সৃজনশীল হওয়ার ইচ্ছা প্রক্ষিপ্ত হয়ে যায় অতীতে। (*ইতিহাসের উত্তরাধিকার*, আনন্দ, কলকাতা, ২০০০। পৃ. ১৮৪)

অতীত, শাস্ত্র, পরম্পরাগত শিক্ষা এবং দেশজ জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি ঔদাসীন্য আর হাব-ভাব, চাল-চলন জানাটাই প্রকৃত জানা, এমন সংস্কারই যে স্বাতন্ত্র্য হারানোর প্রক্রিয়ার একটি বড় উপাদান সে কথাও আজ প্রমাণ করা কঠিন নয়। আরো আশ্চর্যের কথা এই যে এই কথার সমর্থন পাওয়া যাবে রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য অনেক লেখায় আর কাজে।

এমনই এক দেশজ আবিষ্কার আমাদের সঙ্গীতের তালপদ্ধতি। অভারতীয় সঙ্গীতে এর প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। সঙ্গীতের জগতে এটি একেবারেই ভারতবর্ষের নিজস্ব অবদান। আর তাল যে ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, সে কথাটাও গোড়া থেকেই মনে রাখা দরকার। 'তালবাদ্য' বলে একটি খুব প্রচলিত শব্দ আছে। তার মানে এই হল যে, তাল গাওয়া হয় না, ওটা বাদ্যের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাই যদি হত তাহলে বাদ্যযন্ত্র ছাড়া গান হলে কেমন করে বুঝি কোথায় সম, কোথায় খালি? অন্য ধারণাটি হল এই যে সব বাদ্যই তালবাদ্য নয়, কেবলমাত্র চর্মবাদ্যই তালবাদ্য। তার মানে দাঁড়ালো এই যে সেতার সরোদে তাল বাজে না। দুটি ধারণাই ভ্রান্ত। আরেকটি যুক্তিও অনেক সময় শোনা যায়। পাখোয়াজ-তবলায় শুধুই তাল বাজে। পাখোয়াজ-তবলার নির্মাণকৌশল, বিশেষ করে দুটি স্তরে চামড়া লাগানো, গাব-এর ব্যবহার ও সবদিক এক সুরে বাঁধতে পারার ব্যবস্থা—এদের আওয়াজে যে অনুরণন ও 'টোন' তৈরি করে তাও ভারতবর্ষের নিজস্ব অবদান। অভারতীয় সমস্ত চর্মবাদ্যে এই দুটি উপাদানের অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। আর তাই তবলা-পাখোয়াজ শুধুই তালে কথা বলে না, 'টোন' এবং বাণীর অসংখ্য গাঢ়তা, লঘুতা ও রঙের বিন্যাস তবলা-পাখোয়াজ সঙ্গীতে ভাব প্রকাশের অন্যতম উপাদান।

অন্য যে কথাটি আমাদের মনে রাখা উচিৎ সেটি হল ছন্দ আর তাল এক জিনিস নয়। ছন্দ চলে সরলরেখায় ২-২, ৩-৩, ৪-৪, ২-৩ ইত্যাদি। এর প্রয়োগ পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যাবে। তাল চলে চক্রাকারে— তাল ছন্দ নয়, ছন্দের সমাহার। অর্থাৎ চার মাত্রা সে এগোলে চার মাত্রা পিছিয়ে এসে বৃত্ত সম্পূর্ণ করে পূর্ণতা লাভ করে। অসম বিভাজন, যেমন ৩। ২। ২ ইত্যাদিও হতে পারে, সে ক্ষেত্রে তার গড়নে, চলনে আর বাণীর বিন্যাসে চক্রাকার গতি পরিস্ফুট হয়। সঙ্গীতের ভাষায় একেই বলে খুলি-মুদি, খোলা এবং বন্ধ হওয়া। পুরুষ-প্রকৃতির মত, দু'এ মিলে তবেই পূর্ণতা। বিভিন্ন ছন্দ লুকিয়ে থাকে, খেলা করে এই তালের কাঠামোর ভিতরে নানান ভাবে নির্দিষ্ট তালের এবং খুলি-মুদির এই বৈশিষ্ট নষ্ট না করে। আমাদের দেশের সমস্ত সুরের কাঠামোয় তা সে শাস্ত্রীয় হোক অথবা তুসু, ভাওয়াইয়া, বাউল কি কীর্তন—সর্বত্রই খুলি— মুদির এই স্বাভাবিক উপস্থিতি লক্ষণীয়।

এইবার শোনা যাক তাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য/অভিযোগ। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন,

> কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে এই ভরসা করিয়া গান বাঁধিতে চাহিলাম। তাহাতে কী উৎপাত ঘটিল একটা দৃষ্টান্ত দিই। মনে করা যাক আমার গানের কথাটি এই,
>
> কাঁপিছে দেহলতা থরথর
> চোখের জলে আঁখি ভরভর।...
>
> এ ছন্দে আমার পাঠকেরা কিছু আপত্তি করিলেন না। তাই সাহস করিয়া ঐটেই ঐ ছন্দেই সুরে গাহিলাম। তখন দেখি যাঁরা কাব্যের বৈঠকে দিব্য খুশি ছিলেন তাঁরাই গানের বৈঠকে রক্তচক্ষু। তাঁরা বলেন—এ ছন্দের এক অংশে সাত আর এক অংশে চার, ইহাতে কিছুতেই তাল মেলে না।

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রশ্ন ও সিদ্ধান্ত,

> ছন্দে যদি দোষ না থাকে, তবে সুরে গান করিলে, কেন তালযোগে সঙ্গীত করা যাইবে না? এ কথা কি বেশ পরিষ্কার করিয়া তালতত্ত্ব-বিদ্‌গণকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল? কবিতাটি যেমনই হউক, সপ্তমে চতুর্থে যদি বিন্যস্ত

> আছে। ... ইহাও সেই একাদশাক্ষরনিবদ্ধ বর্ণবৃত্ত 'বিলাসিনী' ছন্দের স্বরূপ। ... সুতরাং হ্রস্ব-দীর্ঘ -বিবর্জিত বাঙ্গলা পদ্য সাহিত্যে সপ্তমে চতুর্থে যদি বিন্যস্ত একাদশাক্ষরাত্মক 'বিলাসিনী' ছন্দ কবির অভিপ্রায় অনুযায়ী ছন্দে গান করিলে, তালযোগে তাহার সহিত সঙ্গত অনায়াসে চলিবার কথা।
>
> কবি লিখিয়াছেন যে এই পাঁচচারে যদি বিন্যস্ত নবাক্ষরবৃত্ত ছন্দটিকে উলটাইয়া চতুর্থে পঞ্চমে যদি বিন্যস্ত করিয়া নূতন ছন্দে গান রচনা করিয়া, নয় মাত্রার ছন্দকে নয়ছয় করিতে পারা যায়। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, তালজ্ঞ ব্যক্তিও ঠিক তদনুরূপ চতুর্থ পঞ্চমে প্রদর্শিত লয়বিশিষ্ট শাস্ত্রসিদ্ধ তালযোগে সঙ্গত করিয়া সভামধ্যে কবির সহিত নকড়া-ছকড়া খেলিতে পারেন।

রবীন্দ্রনাথের গানের গঠন-কৌশল বুঝতে বিতর্কটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয়, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহই নেই। এইবার 'সঙ্গীতের মুক্তি' (১৯১৭) থেকে তাল সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য উদ্ধৃত করে বুঝতে চেষ্টা করব রবীন্দ্রনাথ তাল বলতে কী বুঝতেন।

'সংগীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল লইয়া। গানবাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই লইয়া বিষম মাতামাতি।' গান আর তাল আলাদা হল, তবে কোন যুক্তিতে, তার ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথ দিলেন না। পাঁচ লাইন পর লিখছেন, 'তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ।' তালকে একটি সাঙ্গীতিক ভাষা হিসেবে না দেখে দেখলেন একটি যন্ত্র হিসেবে। তার লাইন দশেক পর, 'য়ুরোপীয় গানে স্বয়ং রচয়িতার ইচ্ছামত মাঝে মাঝে তালে ঢিল পড়ে এবং প্রত্যেকবারেই সমের কাছে গানকে আপন তালের হিসাব-নিকাশ করিয়া হাঁফ ছাড়িতে হয় না।' অর্থাৎ ইয়োরোপীয় গানের (কোন জাতীয় গান তা অবশ্য পরিষ্কার নয়) ছন্দকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করলেন তাল হিসেবে। সেই 'তাল' এ ঢিল পড়ে। ছন্দান্তরও হয় কিনা অথবা লয়ে ঢিল পড়ে কিনা সেই তথ্য দিলেন না। তার একটু পরই লিখলেন, '... ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের বোধ লইয়া যখন গান লিখিতে বসিলাম, তখন চাঁদ সদাগরের উপর মনসার যেরকম আক্রোশ, আমার রচনার উপর তালের দেবতা তেমনি ফোঁস করিয়া উঠিলেন।' আর তার একটু পরে বলেই ফেললেন, 'কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে...।' ছন্দ আর তাল এক হল। ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বোঝেন বলেই কি ছন্দ আর তাল এক হল না? আরও দু পাতা পরে বললেন, 'চৌতাল তো বারো মাত্রার ছন্দ'। চৌতাল বারো মাত্রার ছন্দ না তাল? চারের ছন্দে ৪ +৪ +৪ = ১২ মাত্রার তাল চৌতাল। একতাল তো চার আর তিন (৩+৩+৩+৩= ১২), দু রকম ছন্দেই চলে-দুই ক্ষেত্রেই সেটা বারো মাত্রার তাল। অন্যদিকে ১৬ মাত্রায় একাধিক তাল আছে তিনতাল, আদ্ধা, তিলুয়াড়া, যৎ ইত্যাদি, ১৪ মাত্রার ধামার, দীপচণ্ডী, ঝুমরা, আড়া চৌতাল ইত্যাদি, প্রতিটি তালেরই গতি ও চরিত্র স্বতন্ত্র। তাহলেও কি তাদের ১৬ মাত্রা ও ১৪ মাত্রার ছন্দ বলা যাবে? শেষ অবধি বললেন, 'কবিতায় যেটা ছন্দ, সংগীতে সেটাই লয়। ... এই লয়কে যদি মানি তবে তালের সঙ্গে বিবাদ ঘটিলেও ভয় করিবার প্রয়োজন নাই।' এইবার, তালকে আলোচনা থেকে সম্পূর্ণ সরিয়ে ফেলা গেল।

তালকে ছন্দ অথবা লয় বলে ভুল বোঝার প্রভাব তাঁর গানে কেমন ভাবে পড়ল, কয়েকটি দৃষ্টান্তসহ দেখা যাক। তালিকায় দেখছি সুরফাঁকতালে রবীন্দ্রসঙ্গীত আছে মোট ১৩টি। ২টি গান বাদে বাকি সব গানই প্রাচীন রচনা। প্রাচীন রচনায় 'বাজাও তুমি কবি' (১৯০২-০৩), 'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল' (১৯০৭-০৮), 'প্রথম আদি তব শক্তি' (১৯১০-১১) ইত্যাদি রচনা আছে। রবীন্দ্রনাথ সুরফাঁকতালে আর গান বাঁধলেন না কেন? সুরফাঁকতালের অষ্টমমাত্রা থেকে 'প্রথম আদি তব শক্তি' শুরু। সুরফাঁকতালের চলন অথবা সম ছাড়া অন্য কোনো মাত্রা থেকে গান শুরু করা কি সঙ্গীতকে সংকীর্ণ করেছে না সমৃদ্ধ করেছে? ১৯৩৮ সালে বর্ষামঙ্গল-উপলক্ষে সঙ্গীতভবনের সেতারের অধ্যাপক, শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের নাড়ি-নক্ষত্র শিক্ষা করা 'সানাড়ি', সুশীলকুমার ভঞ্জ চৌধুরী তিনতালে গৌড় মল্লারের একটি গৎ রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে সে 'গৎটার ডা-ডিরি-ডা-রা বোলগুলো ছন্দ ভাগ করে' লিখে দেন। সেই গৎটিকে রবীন্দ্রনাথ 'মোর ভাবনারে কী হাওয়ায় মাতালো' গানের কথা দিয়ে বাঁধেন। ('গৎ ভাঙা গান'। সুভাষ চৌধুরী, গীতবিতানের জগৎ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৪। পৃ. ৭২১)

মো র। ভা ব না রে। - কী হাও য়ায়।-মা তা লো।
- - - - । দো লে ম ন। দো লে অ কা। র ণ হ র।
ষে- মো র।
হৃ দ য় -। গ গ নে -। স জ ল ঘ।
ন - ন বী। ন মে ঘে -। র সে র -। ধা রা ব র।
ষে - মো র।

তিনতালের ৪+৪+৪+৪=১৬ মাত্রার কাঠামোর ওপর এত রকমের phrasing আর ছন্দের খেলা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব রচনায় কতবার পেয়েছি আমরা? আরেকটা গানের কথা ধরা যাক, 'দীপ নিবে গেছে মম নিশীথসমীরে' (১৯২১)। রবীন্দ্রনাথ কী বলেছিলেন জানিনা। (যদিও 'সঙ্গীতের মুক্তি'-তে বলছেন, 'নূতন তাল রচনা করা যায়') তবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পণ্ডিতরা বলেন এটি রবীন্দ্রসৃষ্ট 'অর্ধঝাপ' তালে বাঁধা। মানে, ঝাপতালের অর্ধেকটা মিলল, তাই অর্ধঝাপ। গোটা গানটির সুরের চলনে আর চরিত্রে ঝাপতালের ১ ২।৩ ৪ ৫।৬ ৭।৮ ৯ ১০-এর গড়ন আর আবর্তন, যে-কোনো গানের গ জানা লোকের পক্ষেও অনুভব করা সম্ভব। গোটা গানটিতে মাত্র চারবার—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগে একবার করে —এর ১০ মাত্রাকে সামলানো গেলো না। তারা ৫ মাত্রা এগিয়েই হোঁচট খেয়ে চলে এল প্রথম মাত্রায়। আর তাই ছন্দ থেকে তালে উত্তরণের সৌন্দর্যকে অসম্মানিত করে তাকে টেনে নামানো হল ফের ছন্দের হিসেবে। শুধু তাইই নয়, তাকে বলা হল 'তাল'। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনায় সাধারণ ৬ মাত্রার দাদরা অথবা ৮ মাত্রার কাহারবা তালেও এই গোলমাল আছে। তবে এই ক্ষেত্রে কেউ এগুলিকে উপলক্ষ করে অর্ধ দাদরা বা অর্ধ কাহারবা নাম দিয়ে 'নতুন' তাল সৃষ্টি করেননি। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইয়েদের সঙ্গে খোল-তবলা বাজাবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁদের সকলেরই এই বে-তালের সঙ্গে বোঝাপড়া করার যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা আছে।

অথচ রবীন্দ্রনাথের প্রিয় এমনকি বাউল গানেও এই সমস্যা নেই। একহাতে একতারা, অন্য হাতে ডুগি, পায়ে ঘুঙুর, শরীরে নাচ আর গলায় গান—একই সঙ্গে এই সব ক'টি চলে বাউল গানে। এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সঙ্গীতের জগতে বিরল। আর এটি সম্ভব হয়েছে দীর্ঘ অনুশীলন, দমের চর্চা আর সাধনার ফলে। যে কীর্তন গান নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্র ছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি-পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল' সেই 'শাস্ত্র ছাড়া মুক্তি-পাওয়া চিত্ত' ও যখন গানে আত্মপ্রকাশ করল, সেখানেও এই সমস্যা নেই। কীর্তনের পিছনেও তো আছে দীর্ঘ অনুশীলন আর সাধনা।

রবীন্দ্রসঙ্গীত

যে কোনো রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনেই কি আমরা বুঝতে পারি যে এটি রবীন্দ্রনাথের রচনা? হয়ত পারি না, তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পারি। কী সেই বৈশিষ্ট যা রবীন্দ্রসঙ্গীতকে অন্য বাঙলা গান থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করতে পারে? রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে রবীন্দ্রনাথের গানের সাঙ্গীতিক কাঠামোর বিবর্তন আর তাঁর গানের নির্মাণকৌশলের বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এ কাজ কেবলমাত্র রবীন্দ্রসঙ্গীতের চরিত্র বোঝার জন্যই প্রয়োজন, এমন নয়। এই কাজ অনেক যত্নে আমরা না করে উঠতে পারলে বাঙলা গান ক্রমাগত হয়ে উঠবে 'কথা' সর্বস্ব।

এই প্রবন্ধ লিখতে নিম্নলিখিত ডিভিডি ও গ্রন্থগুলির সাহায্য নিয়েছি।

১। ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ত্রিবেণীসঙ্গম, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮০ (১৯৭৪)
২। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কলকাতা ১৩৯৯ (১৯৯২)।
৩। সুভাষ চৌধুরী, গীতবিতানের জগৎ, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৪।
৪। পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার, গীতবিতান আর্কাইভ, ডিভিডি, সারেগামা, কলকাতা, ২০০৬।

নন্দন, (Volume XXVII2007) কলাভবন, শান্তিনিকেতন-এ প্রকাশিত প্রবন্ধের পরিবর্ধিত রূপ।